সূরা আত তাওবার তাফসীরঃ (প্রথম পর্ব) শহীদ শায়েখ ডঃ আব্দুল্লাহ আযযাম রহঃ

ভুমিকাঃ

ইন্নাল হামদা লিল্লাহ, নাহমাদুহু ওয়া নাসতা'ঈনুহু ওয়া নাসতাগফিরুহু ওয়া নাউযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা। মান ইয়াহদিহিল্লাহ ফালা মুদিল্লা লাহু, ওয়া মান ইউদলিলিল্লাহ ফালা হাদিয়া লাহু। ওয়া আশহাদু আন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রসুলুহু।

সূরা 'বারাআহ' মদীনায় অবতীর্ণ সর্ব শেষ সূরাসমূহের একটি সূরা। এর সর্বমোট আয়াত সংখ্যা হলো ১২৯। এটি (বিধি বিধান সম্বলিত) সর্বশেষ সূরা হওয়ার কারণে এই সূরার মধ্যে মুসলিম জাতির সাথে অন্যান্য জাতি গোষ্ঠীর সম্পর্কের রূপ রেখা ও ধরণ প্রকৃতি কেমন হবে সে বিষয়ে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে। যেমন মুনাফিকদের সাথে কেমন ব্যবহার করতে হবে, কাফিরদের সাথে কেমন আচরণ করতে হবে ইত্যাদি।

সূরাতুল 'বারাআহ' এর অনেকগুলো নাম রয়েছে। এর একটি নাম হলো 'আত তাওবা'। এ নামে একে নামকরণ করার কারণ হলো এ সূরায় মুসলমানদের জন্য সাধারণ ক্ষমা এবং তিন জন ব্যক্তির জন্য বিশেষ ক্ষমার বিধান এসেছে। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন-

لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم

'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ নবীর উপর এবং সেই সব মুহাজির ও আনসারদের উপর তাওবা কবুল করেছেন যারা কঠিন কষ্টকর অবস্থাতেও তাঁর আনুগত্য করেছে; এমনকি তাদের একটি দলের অন্তর বক্র হয়ে পড়ার উপক্রম হওয়া সত্ত্বেও। অতঃপর আল্লাহ্ তাদের তাওবা কবুল করেছেনএবং সেই তিন জনের তাওবাও কবুল করেছেন যারা নিজেদেরকে (মাসজিদে নববীর খুঁটির সাথে) বেঁধে রেখেছিলো। এক পর্যায়ে পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদের উপর তা সংকীর্ণ হয়ে এসেছিলো, তাদের নিজেদের জীবনও তাদের কাছে সংকীর্ণ হয়ে পড়েছিলো; তারা অনুধাবন করতে পেরেছিলো যে আল্লাহ্ ছাড়া তাদের কোন আশ্রয় নেই। অতঃপর আল্লাহ্ তাদের তাওবা কবুল করলেন, যাতে তারা আবার ফিরে আসতে পারে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তায়ালা তাওবা কবুলকারী ও মহান দয়াময়। (আয়াত ১১৭-১১৮)

উল্লিখিত দুটি আয়াতের শেষ আয়াতে যাদের জন্য বিশেষ ক্ষমা ঘোষণা করা হয়েছে তারা হলেন কা'ব বিন মালিক, হিলাল বিন উমাইয়া ও মুরারা বিন রাবিয়া রাঃ। তাদের ঘটনাটি খুবই চমৎকার ও শিক্ষণীয়, ইনশা আল্লাহ্ যথাস্থানে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

এ সূরাকে সূরা *'আল ফাযিহা'* বা 'লাঞ্ছনাকারী, মুখোশ উন্মচনকারী' নামেও নামকরণ করা হয়; কারণ এ সূরা মুনাফিকদের মুখোশ উন্মোচন করে তাদেরকে জনসমক্ষে লাঞ্ছিত করেছে।

সাঈদ বিন জুবাইর রহঃ বলেন, আমি ইবন আব্বাস রাঃ কে এ সূরা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন এটা তো *'আল ফাযিহা'* বা লাঞ্ছনাকারী, মুখোশ উন্মচনকারী। এ সূরা 'কিছু লোক রয়েছে যারা এমন' 'কিছু লোক রয়েছে

যারা তেমন’ এভাবে একেক শ্রেণীর লোকদেরকে ধরে ধরে তাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে লাগলো; এমনকি এক পর্যায়ে আমাদের আশংকা হতে লাগলো যে এ সূরা বুঝি শেষ পর্যন্ত কাউকেই ছাড়বে না।

সত্যিই এ সূরা মুখোশ উন্মোচনকারী। মুনাফিকদের মুখোশ খুলে ফেলে এ সূরা তাদের চরিত্র বৈশিষ্ট্য ও তাদের গোপন অভিসন্ধিকে মানুষের সামনে ফাঁস করে দিয়েছে।

এ সুরার আরেক নাম হলো ‘আল বুহুস’ বা আলোচনা। এ সুরায় মুনাফিকদের গোপনীয়তা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। এ সূরার আরেকটি নাম হল ‘মুবআসিরা’ যার অর্থ ‘ফাযিহা’ এর অর্থেরই সমার্থবোধক।

এই সূরার একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হলো গোটা কুরআনুল কারীমে এটিই একমাত্র সূরা যার শুরুতে বিসমিল্লাহ লেখা নেই। কেন এ সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ নেই- এ বিষয়ে বেশ কয়েকটি অভিমত রয়েছে।

প্রথম অভিমতঃ জাহেলী যুগে আরবদের নীতি ছিলো কোন সম্প্রদায়ের সাথে তারা তাদের ইতিপূর্বে সম্পাদিত কোন শান্তি-চুক্তি বাতিল করতে চাইলে তারা একটি চুক্তি-ভঙ্গনামা লিখতো, আর এই চুক্তি-ভঙ্গনামায় তারা কখনো বিসমিল্লাহ লিখতো না। আল্লাহ্ আযযা ওয়া জাল্লা এই সূরার মাধ্যমে আল্লাহ্র রসূল ও মুশরিকদের মাঝে বিদ্যমান সাধারণ চুক্তি বাতিলের ঘোষণা দেন এবং তাদেরকে চার মাসের অবকাশ দেন; আর যাদের সাথে পূর্বে সম্পাদিত কোন মেয়াদী চুক্তি রয়েছে সে চুক্তি তার মেয়াদ পর্যন্ত বলবৎ থাকার ঘোষণা দেন। এ সূরায় যেহেতু শান্তিচুক্তি বাতিলের ঘোষণা দেয়া হয়েছে তাই এই সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ লেখা হয়নি।

দ্বিতীয় অভিমতঃ ইবনে আব্বাস রাঃ থেকে বর্ণীত রয়েছে যে তিনি বলেন, আমি উসমান রাঃ কে জিজ্ঞাসা করলাম সূরা আল আনফাল তো ‘মাসানী’র অন্তর্ভুক্ত (মাসানী হলো যেসব সূরা একেবারে ছোটও নয় আবার যার আয়াত সংখ্যা একশ’রও বেশী নয়) আর সূরা বারাআহ তো ‘মুআইয়ান’ (যে সূরার আয়াত সংখ্যা একশ’র বেশী) তারপরও আপনি সূরা বারাআহকে কেন সূরা আল আনফালের পাশে রাখলেন এবং এ দু’টির মাঝখানে বিসমিল্লাহ লিখলেন না? আবার এ সূরাটিকে কুরআনের বৃহৎতম সাতটি সূরার মধ্যেও শামিল করলেন? উসমান রাঃ বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর যখন কোন আয়াত অবতীর্ণ হতো তখন ওয়াহী লেখকদের কাউকে ডেকে বলতেন এই আয়াত অমুক সূরার অমুক অংশে লিখে রাখো। সূরা আল আনফাল ছিলো মদিনার জীবনের প্রথম দিকে অবতীর্ণ সূরা আর সূরা বারাআহ ছিলো একেবারে শেষ দিকে অবতীর্ণ সূরাসমূহের অন্তর্ভুক্ত কিন্তু উভয় সূরার আলোচ্য বিষয় প্রায় একই রকম। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমদেরকে এ সুরাটি কোথায় রাখতে হবে সে বিষয়টি সুনির্দিষ্টভাবে বলে দেয়ার পূর্বেই আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে তুলে নেন। অতঃপর আমরা ভেবেছি এ সুরাটি ঐ সূরারই অংশ তাই আমরা এ দু’টিকে পাশাপাশি রেখেছি এবং মাঝখানে বিসমিল্লাহ লেখা থেকে বিরত থেকেছি। (উত্তম সনদে ইমাম তিরমিযী হাদিসটি সংকলন করেছেন)

তৃতীয় অভিমতঃ খারিজা, আবু ইসমা ও অন্যন্যরা বলেন, উসমান রাঃ এর খিলাফাতকালে যখন কুরআনুল কারীমের কপি লেখা হচ্ছিলো তখন বারাআহ ও আনফাল কি একটি সূরা না দু’টি ভিন্ন ভিন্ন সূরা তা নিয়ে সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। তাই উভয় সূরার মাঝখানে একটু ফাকা রাখা হয় যাতে দুই সূরার প্রবক্তাদের মতের প্রতি সম্মান জানানো হয়, আর উভয় সূরার মাঝখানে বিসমিল্লাহ লেখা ছেড়ে দেয়া হয় এক সূরার প্রবক্তাদের মতের প্রতি সম্মান জানিয়ে। আর এতে উভয় মতের মধ্যে একটি সুন্দর সমন্বয় সাধন সম্ভব হয় এবং উভয় মতের প্রবক্তারা বিষয়টি সানন্দে মেনে নেন।

চতুর্থ অভিমতঃ আর এটা হলো আলী রাঃ এর বক্তব্য। আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাঃ বলেন, আমি আলী রাঃ কে জিজ্ঞাসা করলাম সূরা বারাআহর শুরুতে কেন বিসমিল্লাহ লেখা হয়নি? তিনি বলেন, এর কারণ হলো, বিসমিল্লাহ হলো নিরাপত্তার নিদর্শন, আর সূরা বারাআহ অবতীর্ণ হয়েছে নিরাপত্তা বাতিল করে তলোয়ার নিয়ে, এর মধ্যে কোন নিরাপত্তা নেই।

হযরত সুফিয়ান ইবন উওয়াইনা রহঃ থেকেও একই ধরণের কথা বর্ণীত রয়েছে। কারণ সূরা বারাআহ সত্যিই তো চূড়ান্ত কঠোরতা নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছে; আর বিসমিল্লাহ তো রহমত, রহমত অর্থ নিরাপত্তা। পক্ষান্তরে এ সূরা অবতীর্ণ হয়েছে মুনাফিকদের সম্পর্কে এবং (কাফিরদের বিরুদ্ধে) তলোয়ার নিয়ে, মুনাফিক কিংবা তলোয়ার কোনটার সাথেই তো নিরাপত্তার কোন সম্পর্ক নেই।

পঞ্চম অভিমতঃ ইমাম কুরতুবী রহঃ বলেন সঠিক কথা হল জিবরীল আঃ এ সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ নিয়ে অবতীর্ণ হননি আর তাই এখানে বিসমিল্লাহ লেখা হয়নি। বিসমিল্লাহ তো আল্লাহ্‌র রসূলের পক্ষ থেকে লেখা হতো না; বরং জিবরীল আঃ এটা নিয়ে অবতীর্ণ হতেন। যেহেতু তিনি এই সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ নিয়ে অবতীর্ণ হননি তাই এখানে বিসমিল্লাহ লেখা হয়নি। ইমাম কুশায়রীও একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

তাফসীর শুরু

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بَرَاءةٌ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ مِنْ الْمُشْرِكِينَ فَسِيحُوا فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ
وَأَذَانٌ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ.

সুর বারাআহ নবম হিজরীতে মদিনায় অবতীর্ণ হয়। এ সুরায় তাবুক যুদ্ধ, যুদ্ধের প্রস্তুতি, যুদ্ধের পূর্বে ও পরে মদীনাবাসীদের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ সূরার কিছু অংশ অবতীর্ণ হয় তাবুক যুদ্ধের পূর্বে আর কিছু অংশ অবতীর্ণ হয় যুদ্ধের পরে। নবম হিজরীর রজব মাসে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনে এটিই শেষ যুদ্ধ, এর পর তিনি আর কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সশরীরে এসব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন সেগুলো হলো-

১) বদর যুদ্ধ। দ্বিতীয় হিজরীর রমযান মাসে তা সংঘটিত হয়েছিলো।

২) ওহুদ যুদ্ধ। তৃতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসে তা সংঘটিত হয়েছিলো।

৩) বনু নাযীরের যুদ্ধ। এটিও সংঘটিত হয়েছিলো তৃতীয় হিজরী সনে।

৪) মুরাইসী বা বনু মুস্তালিকের যুদ্ধ। এটির সময়কাল নিয়ে কিছুটা ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে; কেউ বলেন চতুর্থ হিজরীতে আবার কেউ বলেন ষষ্ট হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিলো।

(৫) খন্দক যুদ্ধ। সংঘটিত হয়েছিলো ৫ম হিজরীতে শাওয়াল মাসে।

৬) হুদাইবিয়া অভিযান। এটি সংঘটিত হয়েছিলো ষষ্ট হিজরিতে।

৭) খায়বার যুদ্ধ। সংঘটিত হয়েছিলো সপ্তম হিজরীতে।

৮) মূতার যুদ্ধ। অষ্টম হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিলো।

৯) মক্কা বিজয়ের যুদ্ধ। সংঘটিত হয়েছিলো অষ্টম হিজরীর রমযান মাসে।

১০) হুনাইনের যুদ্ধ। অষ্টম হিজরীর শাওয়াল মাসে।

১১) তায়েফের যুদ্ধ। অষ্টম হিজরীর শেষ দিকে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়।
১২) তাবুক যুদ্ধ। নবম হিজরীর রজব মাসে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়।
এক দিন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বপ্নে দেখলেন যে তিনি বাইতুল্লায় উমরা করছেন এবং বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করছেন। এর পর তিনি তাঁর চৌদ্দ পনের শত সাহাবীকে নিয়ে ষষ্ট হিজরীর যুল ক'দ মাসে মক্কার পথে রওয়ানা হন। এদিকে কুরাইশরা যখন শুনতে পেলো যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কা'বার তাওয়াফ করতে মক্কা আসছেন তারা খুবই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। তারা বলল আমরা এখানে থাকতে কিছুতেই তাদেরকে মক্কায় প্রবেশ করতে দেয়া হবে না। উদ্ভুত পরিস্থিতিতে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুদাইবিয়ার যে অংশ হারামের অন্তর্ভুক্ত নয় সেখানে অবস্থান নিলেন।হারামের মধ্যে সালাত আদায়ের ফযীলত পাওয়ার জন্য কেবল সালাতের সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হারামের সীমানার ভিতরে প্রবেশ করে সালাত আদায় করে আবার সালাত শেষে হারামের সীমানার বাইরে পূর্বের স্থানে ফিরে যেতেন।
রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাইশদের একগুয়েমী ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়ার কথা শুনে বললেন, ধ্বংস কুরাইশদের! যুদ্ধ তাদেরকে শেষ করে দিলো। কি ক্ষতি হতো তাদের তারা যদি আমার ও আরবদের মাঝখান থেকে সরে যেতো! যদি তারা আমার উপর বিজয়ী হতো তাহলে তো তারা তাদের ইচ্ছা পূরণ করতে পারতো; আর যদি আমি বিজয়ী হতাম তাহলে তো তারা ইসলাম গ্রহণে ধন্য হতো! আর তারা যদি আমার সাথে যুদ্ধ করতে চায় তবে তা করতে পারে, তাদের তো সে শক্তি আছে। কিন্তু কুরাইশরা ভেবেছে কি! যিনি আমাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ করে বলছি হয় আল্লাহ্ তায়ালা তায়ালা এই দ্বীনকে বিজয়ী করবেন অথবা আমি এ দ্বীনের প্রচার প্রসার করতে করতে এ পথেই নিঃশেষ হয়ে যাবো।
হুদাইবিয়া পৌঁছানোর পর আল্লাহ্র রসূলের বাহন উটটি বসে পড়লো, তাকে প্রহার করা হলো কিন্তু তবুও সে উঠলো না। লোকেরা বলাবলি করতে লাগলো যে কাসওয়া (আল্লাহ্র রসূলের উটটির নাম) অবাধ্য হয়ে পড়েছে, কাসওয়া অবাধ্য হয়ে পড়েছে। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, কাসওয়া অবাধ্য হয়ে পড়েনি আর অবাধ্যচারিতা কিংবা অলসতা তার স্বভাবও নয়। (আবরাহার) হাতিকে যে জিনিষ আঁটকিয়েছিলো তাকেও সেই একই জিনিষ আঁটকে দিয়েছে। তারপর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আজ কুরাইশরা আমার কাছে যে কোন প্রস্তাব নিয়ে আসবে আমি তা মেনে নেবো।
এদিকে কুরাইশরা একের পর এক লোক পাঠাতে লাগলো। এক পর্যায়ে তারা উরওয়া বিন মাসউদ আস সাকাফীকে পাঠালো। উরওয়া ছিলো আরবের অন্যতম সম্পদশালী ও নেতৃস্থানীয় লোক, তবে সে ছিলো অন্ধ। সে এসে বলল, হে মুহাম্মাদ, তুমি কি আরবের বিভিন্ন গোত্রের লোকদেরকে একত্রিত করে নিজ জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছো? সে আল্লাহ্র রসূলের পাশে বসে কথা বলতে বলতে আল্লাহ্র রসূলের দাঁড়ি মুবারকের মধ্যে হাত বুলাচ্ছিলো। আর যখনি সে আল্লাহ্র রসূলের দাড়িতে হাত দিচ্ছিলো মুগীরা বিন শু'বা আস সাকাফী রাঃ তলোয়ারের বাট দিয়ে তার হাত সরিয়ে দিয়ে বলছিলেন, আপনি আল্লাহ্র রসূলের দাড়িতে হাত দিবেন না। সে জিজ্ঞাসা করলো, এ ব্যক্তি কে? উপস্থিত অন্যরা বললো উনি মুগীরা। হযরত মুগীরার নাম শুনে সে বললো, হে লজ্জাকাতর ব্যক্তি আমি কি তোমার লজ্জস্কর বিষয়টি গোপন করেরেখেছিলাম না?
হযরত মুগীরা রাঃ জাহিলী যুগে ডাকাত লুণ্ঠনকারী, শক্তিশালী অহংকারী গোছের লোক ছিলেন। ঘটনাক্রমে একবার তিনি কয়েকজন লোককে হত্যা করে ফেলেছিলেন এবং উরওয়া বিন মাসউদ আস সাকাফী তাদের রক্তপণ আদায় করে ঘটনাটি ধামাচাপা দিয়ে রেখেছিলো; এখানে উরওয়া সেদিকেই ইঙ্গিত করে।
এভাবে কুরাইশরা আলোচনার মাধ্যমে সন্ধিচুক্তি করার জন্য একের পর এক লোক পাঠাতে থাকে এবং এক পর্যায়ে তারা সুহাইল বিন আমরকে পাঠায়। তার সাথেই অবশেষে চুক্তির বিষয়বস্তু সম্পর্কে চূড়ান্ত কথা বার্তা হয় এবং চারটি শর্ত সাপেক্ষে সন্ধিচুক্তি সাক্ষরিত হয়। চুক্তির শর্তগুলো ছিলো যথাক্রমে-

১) মুসলমানদের কেউ ইসলাম ত্যাগ করে কুরাইশদের কাছে ফিরে এলে কুরাইশরা তাকে তাদের কাছে রেখে দিবে কিন্তু (মক্কার) কোন কাফির ইসলাম গ্রহণ করে যদি মদিনায় আল্লাহ্‌র রসূলের কাছে যায় তাহলে তিনি তাকে তাঁর কাছে রাখতে পারবেন না।

২) কোন গোত্র চাইলে আল্লাহ্‌র রসূলের সাথে মিত্রতা স্থাপন করতে পারবে, আবার কোন গোত্র চাইলে কুরাইশদের সাথেও মিত্রতা স্থাপন রতে পারবে। *এ সূত্র মতে খুজাআ গোত্র আল্লাহ্‌র রসূলের সাথে মিত্রতা স্থাপন করে আর বনু বকর কুরাইশদের পক্ষ অবলম্বন করে।*

৩) দশ বসরের জন্য অনাক্রমন চুক্তি বা যুদ্ধ বিরতি থাকবে।

৪) এই বসর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমরা না করেই ফিরে যাবেন এবং আগামী বসর এসে তরবারী কোষবদ্ধ অবস্থায় রেখে উমরা করে চলে যাবেন।

মুসলমানগণ (বাহ্যত পরাজয় সুচক) এসব শর্ত দেখে খুবই মর্মাহত হলেন। উমর রাঃ তো মুসলমানদের জন্য এসব শর্তসমূহকে সুস্পষ্ট অপমানজনক মনে করে আর নিজেকে সংবরণই করতে পারলেন না। তিনি সোজা আল্লাহ্‌র রসূলের সামনে গিয়ে বললেন,

ইয়া রসুলাল্লাহ! আমরা কি সত্যের উপর নই? রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ।

তারা কি বাতিলের উপর নয়? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

তাহলে আমরা কেন আমাদের দ্বীনের মধ্যে অপমানজনক বিষয়ের অনুপ্রবেশের সুযোগ দিবো?

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'নিশ্চয়ই তিনি (আল্লাহ্‌) আমার রব এবং তিনি কখনোই আমার ক্ষতি করবেন না। আমার রবই আমাকে (একাজের) নির্দেশ দিয়েছেন, আর আমি তাঁর নির্দেশ অমান্য করতে পারবো না।

অতঃপর উমর রাঃ আবু বকর রাঃ এর নিকট গিয়ে বললেন,

আমরা কি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নই?

তিনি বললেন, অবশ্যই আমরা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

তারা কি বাতিলের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়?

তিনি বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই তারা বাতিলের উপর প্রতিষ্ঠিত।

তাহলে কেন আমরা আমাদের দ্বীনের মধ্যে লাঞ্ছনাকর বিষয় মেনে নিবো?

আবু বকর রাঃ বলেন, নিশ্চয়ই তিনি সত্যের উপর রয়েছেন তাঁর সিদ্ধান্ত মেনে নিন, নিশ্চয়ই তিনি সত্যের উপর রয়েছেন তাঁর সিদ্ধান্ত মেনে নিন।

মুসলমানদের মনোকষ্ট আরও বেড়ে গেলো যখন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাইশদের তরফ থেকে চুক্তি সম্পাদনের দায়িত্বে নিয়োজিত সুহাইল বিন আমরকে বললেন, লেখো 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' সে বলল আমি 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' চিনি না। তারপর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ঠিক আছে লেখো 'বিসমিল্লাহ' বা 'বিসমিকাল্লাহুম্মা' সুহাইল বলল হ্যাঁ ঠিক আছে এটা লেখা যায়। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তারপর বললেন, লেখো 'আল্লাহ্‌র রসূল মুহাম্মাদ যে বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন' সুহাইল বলল আমরা তো আপনাকে আল্লাহ্‌র রসূল হিসেবে স্বীকার করি না, যদি আল্লাহ্‌র রসূল হিসেবে স্বীকারই করতাম তাহলে তো আপনার আনুগত্যই করতাম। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঠিক আছে লেখো 'মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ যে সব বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন'।

এভাবে সন্ধিপত্র লিপিবদ্ধ হচ্ছিলো ঠিক এরই মধ্যে চুক্তি লেখার দায়িত্বে নিয়োজিত কাফিরদের এই নেতার ছেলে আবু জান্দাল বিন সুহাইল বিন আমর রাঃ শিকলে আবদ্ধ অবস্থায় এসে উপস্থিত হলেন।

আবু জান্দালকে দেখেই সুহাইল বলে উঠলো, ইয়া মুহাম্মাদ চুক্তি তো সম্পাদিত হয়ে গিয়েছে। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ।

আবু জান্দাল রাঃ চিৎকার করে বলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আপনি যদি আমাকে তাদের কাছে ফিরিয়ে দেন তাহলে তারা আমার উপর নির্মম নির্যাতন নিপীড়ন করবে, আমাকে আমার দ্বীন ত্যাগ করতে বাধ্য করবে৷ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে আবু জান্দাল! ধৈর্য ধারণ করো, আল্লাহ্‌ তায়ালা তোমার এবং তোমার মতো অন্যান্যদের জন্য শীঘ্রই মুক্তির উপায় বের করে দিবেন৷
এরপর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদেরকে (হজ্জের কোরবানীর জন্য নিয়ে আসা) উট কোরবানী করার নির্দেশ দেন; কিন্তু তারা (মনোকষ্টে ভেঙ্গে পড়ার কারণে) সে হুকুম পালন করতে কিছুটাগড়িমসি করতে লাগলেন৷ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মে সালমা রাঃ এর কাছে গেলেন এবং বললেন, আমার কওমের লোকেরা তো ধ্বংস হয়ে গেলো, এরা তো ধ্বংস হয়ে গেলো! এরা আমার হুকুম অমান্য করেছে৷ উম্মে সালমা রাঃ বলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ আপনি কোরবানীর পশু জবাই করুন, আপনার মাথা মুণ্ডন করুন, দেখবেন তারা ঠিকই আপনার অনুসরণ করবে৷ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাঁর উট জবাই করলেন, মাথা মুণ্ডন করলেন এবং সাহাবায়ে কেরামগনও তাঁর অনুসরণ করলেন৷ এ ঘটনার পরপরই সূরা আল ফাতহ নাযিল হলো৷ আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেন-

إنا فتحنا لك فتحا مبينا

‘নিশ্চয়ই আমি তোমার জন্য সুস্পষ্ট এক বিজয়ের দ্বার উন্মোচন করেছি’।
(সূরা আল ফাতহ, আয়াত ১)

অতএব হুদাইবিয়ার সন্ধি নিশ্চয়ই এক সুস্পষ্ট বিজয় ছিলো৷ এ সুরায় আল্লাহ্‌ তায়ালা আরও বলেন-

وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها
আল্লাহ্‌ তায়ালা তোমাদেরকে প্রচুর পরিমানে গনীমত লাভের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং তিনি তোমাদের জন্য এই (বিজয়কে) তরান্বিত করলেন, লোকদের হাত তোমাদের থেকে সংযত রাখলেন যেন তা ঈমানদারদের জন্য একটি নিদর্শন হতে পারে এবং তোমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করতে পারে৷ (সূরা আল ফাতহ আয়াত ২০)

আল্লাহ্‌ তায়ালা এ আয়াতে রোম ও পারস্য সাম্রাজ্য এবং অন্যান্য বড়ো বড়ো বিজয়ের সুসংবাদ দান করেছেন৷
রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যিলহজ্জ মাসেই মদিনায় এসে পৌঁছান এবং যিলহজ্জ মাস পুরাটাই মদিনায় অবস্থান করেন৷ এরপর তিনি খায়বার যুদ্ধের অভিযানে বের হন৷ এ যুদ্ধে অংশগ্রহণের ব্যপারে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু তাদেরকেই অনুমতি দান করেন যারা হুদাইবিয়ার অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলেন৷ তিনি সদ্য নাযিল হওয়া কুরআনের আয়াত দ্বারা এ ইঙ্গিত পেয়েছিলেন যে খায়বার যুদ্ধে তিনি বিজয় লাভ করবেন৷ খায়বার বিজয়ের পর খায়বারের বিষয় সম্পত্তি দুই ভাগ করে এক ভাগ এই শর্তে ইহুদীদেরকে প্রদান করেন যে তারা সে ভূমিতে উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক রাজস্ব সরূপ মদিনায় পাঠাবে৷ আর অর্ধেক তিনি সাহাবায়ে কেরামের মাঝে বন্টন করে দেন৷ প্রত্যেক ব্যক্তি পান এক ভাগ এবং অশ্বারোহী সৈন্যরা তাদের অশ্বের ভাগ হিসেবে প্রত্যেকে অতিরিক্ত দুই ভাগ করে লাভ করেন৷ অশ্বারোহী সৈন্যের সংখ্যা ছিলো দুইশত৷ এ হিসেবে গনীমতের দ্বিতীয় অংশকে তিনি মোট ১৮ শত ভাগ করেন ৬ শত ভাগ প্রদান করেন ২ শত অশ্বারোহী সৈন্যদেরকে আর ১২ শত ভাগ পদাতিকদের মাঝে বন্টন করে দেন৷

খায়বারের যুদ্ধের পর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদিনায় অবস্থান করছিলেন তখন হরত আবু বাসীর রাঃ ইসলাম গ্রহণ করে মক্কা থেকে পালিয়ে আশ্রয় নিতে মদিনায় আসেন। আবু বাসির রাঃ মদিনায় আসার পরপরই কুরাইশরা তাদের দুই জন প্রতিনিধি পাঠায় সন্ধির শর্ত মোতাবেক তাকে ফেরত নিতে। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বাসীর রাঃ কে ফিরিয়ে দিলেন। আবু বাসীর রাঃ বলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ আপনি আমাকে তাদের কাছে ফিরিয়ে দিচ্ছেন, তারা তো যুলুম নির্যাতন করে আমাকে আমার দ্বীন থেকে বিচ্যুত করতে সব কিছু করবে। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে শান্তনা দিয়ে বলেন-

اصبر فانّ الله جاعل لك ولمن معك مخرجاً

'ধৈর্য ধারণ করো, আল্লাহ্ তায়ালা শীঘ্রই তোমার জন্য এবং তোমার মতো আরও যারা রয়েছে তাদের সকলের জন্য মুক্তির পথ তৈরী করে দিবেন'।

আবু বাসীর রাঃ দু'জন কাফিরের সাথে মক্কার পথে ফিরে চললেন। পথিমধ্যে তাদের এক জন এক বাগানে খেজুর খেতে প্রবেশ করলো; আর আবু বাসীর রাঃ অদুরে অন্য লোকটির সাথে অপেক্ষা করছিলেন। হঠাত তার মাথায় এক বুদ্ধি খেলে গেলো, এক সংকল্প তৈরি হয়ে গেলো। তিনি তার সঙ্গীকে বললেন, তোমার তলোয়ারখানা তো দারুন চমৎকার, একটু ছুঁয়ে দেখতে পারি? আত্ন প্রশংসায় গদগদ হয়ে কাফির তার তলোয়ারখানা আবু বাসীর রাঃ এর হাতে তুলে দিলো। আবু বাসীর রাঃ তলোয়ারখানা হাতে নিয়ে আর দেরী করলেন না, অতর্কিতে কাফিরের গর্দানে আঘাত হানলেন, মুহূর্তে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। একে বধ করে তিনি অন্য কাফিরটির দিকে তেড়ে গেলেন, কিন্তু সে দৌড়ে পালিয়ে কোনমতে অক্ষত অবস্থায় মদিনায় পৌঁছে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ঘটনা অবহিত করলেন। তিনি শুনে বললেন-

ويح أمه مسعر حرب - لو كان معه رجال, ويح أمه مسعر حرب لو كان معه رجال

হায় হায়! এ তো যুদ্ধের আগুন প্রজ্জলিত করে দিলো! হায় হায়! এ তো যুদ্ধের আগুন প্রজ্জলিত করে দিলো! তার সাথে যদি আরও অনেক লোকজন থাকতো!

তারপর সে লোকটি মক্কা ফিরে গেলো, কিন্তু আবু বাসীর রাঃ মদিনায় ফিরে গেলেন না, তিনি মদিনা থেকে পশ্চিম দিকে লোহিত সাগরের উপকুল ঘেঁষে ঈস নামক স্থানে গিয়ে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করলেন; এমনই এক সামরিক ঘাঁটি যার সদস্য সংখ্যা মাত্র একজন; তিনি আবু বাসীর রাঃ, তিনি একাই সেনাপ্রধান এবং একাই সিপাহী।

এরপর মক্কার নির্যাতিত মুসলমানদের নিকট যখন আবু বাসীর রাঃ এর খবর যখন পৌঁছল তখন সর্ব প্রথম আবু জান্দাল রাঃ এসে আবু বাসীর রাঃ এর সামরিক ঘাঁটিতে যোগ দিলেন। *'হে আবু বাসীর এগিয়ে চলো, শীঘ্রই আবু জান্দাল তোমার সাথে মিলিত হবে ইনশা আল্লাহ্'*। (শায়েখ আযযাম রহঃ এখানে তার শ্রোতাদের মধ্যে থাকা দু'জন আরব মুজাহিদের দিকে ইঙ্গিত করেছেন যার একজনের নাম আবু বাসীর এবং অন্যজনের নাম আবু জান্দাল)। এরপর একে একে বেশ কয়েক জন সাহাবী এসে সেখানে জড় হলেন। এরপর তারা পরিকল্পনা করলেন যে তারা কুরাইশদের বানিজ্য কাফেলার উপর আক্রমণ করবেন এবং শাম দেশের সাথে তাদের বানিজ্য পথ বন্ধ করে দিবেন।

তারপর শাম অঞ্চলে যখনই কুরাইশদের কোন বানিজ্য কাফেলা আসা যাওয়া করতো তখনই আবু বাসীর রাঃ সে বানিজ্য কাফেলার উপর আক্রমণ করে তাদের সহায় সম্পদ, বানিজ্য পন্য অর্থকড়ি ছিনিয়ে নিতেন, কখনো তাদেরকে হত্যা করতেন। সব মিলে পরিস্থিতি এমন হয়ে দাঁড়ালো যে শাম দেশের সাথে কুরাইশদের ব্যবসা বানিজ্য একেবারে বন্ধ হয়ে গেলো; তাদের খাদ্য শস্যের অভাব দেখা দিলো। বাধ্য হয়ে তখন তারা মদিনায় দূত পাঠিয়ে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এই মর্মে আবেদন জানালো যে তিনি যেন তাদেরকে মদিনায় ফিরিয়ে আনেন এবং তাদের অনিষ্ঠ থেকে তাদেরকে রক্ষা করেন।

ইয়া আল্লাহ্! সামান্য কয়েকজন যুবক কিভাবে গোটা নগরবাসীর নিরাপত্তা হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছিলো এবং তা মুসলমানদের কতোই না উপকারে এসেছিলো! মাত্র কয়েকজন যুবক একটি গোটা সম্প্রদায়কে শাসাচ্ছে, মক্কার সব

ডাকসাইটে কাফের নেতারা তাদের ভয়ে কাঁপছে। এ যুগেও এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করা সম্ভব। কিছু যুবক মৃত্যুর উপর শপথ গ্রহণ করলে আল্লাহ্ তায়ালা তাদেরকে জীবন দান করবেন।

কুরাইশদের আবেদনের প্রেক্ষিতে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বাসীর রাঃ এর নিকট পত্র পাঠিয়ে তাকে তার সাথী সঙ্গীসহ মদিনায় তাঁর কাছে চলে আসার নির্দেশ দেন। কিন্তু আবু বাসীর রাঃ কুরাইশদের এক কাফেলা আক্রমণ করার সময় তাদের কয়েকজনকে হতাহত করে তিনি নিজেও মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিলেন। তিনি মৃত্যু শয্যায় শায়িত অবস্থায় রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পত্রখানা হাতে পান এবং সে পত্রখানা বুকের উপর রেখেই তিনি ইন্তেকাল করেন।

এদিকে অন্য আরেক ঘটনা ঘটে গেলো। আমি ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে হুদাইবিয়া সন্ধির পর বনু বকর গোত্র যোগ দেয় কুরাইশদের সাথে আর খুযা'আ গোত্র যোগ দেয় আল্লাহ্র রসূলের সাথে। বনু বকর ও খুযা'আ গোত্রের মধ্যে দীর্ঘ দিন থেকে দ্বন্দ সংঘাত চলে আসছিলো। এক দিন খুযা'আ গোত্রের লোকেরা ওতীর নামক স্থান থেকে পানি সংগ্রহ করছিলো তখন বনু বকরের লোকেরা তাদের উপর রাতের আঁধারে আক্রমণ করে তাদের বহু লোককে হত্যা করে ফেলে। এ আক্রমনে কুরাইশরা অস্ত্রশস্ত্র ও জনবল দিয়ে বনু বকরকে সহযোগিতা করে।

এ আক্রমনের সময় আমর ইবন সালেম আল খুযায়ী পালিয়ে সাথে সাথে গিয়ে মদীনায় উপস্থিত হয়ে মাসজিদে নববীর আঙিনায় দাড়িয়ে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় কবিতার মাধ্যমে আল্লাহ্র রসুলকে শুনিয়ে বলেন-

يا رب إني ناشد محمـــــدا
حلف أبينا وأبيه الأتلد
قد كنتم ولدا وكنا والـدا
ثم أسلمـنا فلم ننزع يدا
إن قريشا أخلفوك الموعــدا

ونقضوا ميثاقـــــك المؤكدا

وزعموا أن لست أدعـو أحدا
وهـــم أقل وأذل عـــددا
هم بيتونا بالوتيـــر هج دا
وقتلونـــــا ركع ا وسجدا

'হে আমার রব, আমি মুহাম্মাদকে আমাদের ও তাদের পূর্ব পুরুষদের কসম দিয়ে বলছি
তোমরা সন্তান ছিলে আমরা পিতা ছিলাম (অর্থাৎ আত্মিয়তার সম্পর্ক ছিলো)
তারপর আমরা আত্মসমর্পন করলাম এবং আমরা কোন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিনি
নিশ্চয়ই কুরাইশরা আপনার সাথে কৃত ওয়াদা ও মজবুত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে
তারা ভেবেছে আমি কাউকে ডাকবো না
অথচ তারা সংখ্যায় অল্প ও মর্যাদায় নিচু
তারা রাতের আঁধারে ওতীর নামক স্থানে আমাদের উপর আক্রমণ করেছে
আমাদেরকে নত ও শায়িত অবস্থায় হত্যা করেছে'।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কবিতা শুনে অত্যন্ত মর্মাহত হলেন এবং বললেন- 'হে আমর বিন সালেম আল্লাহ্র সাহায্য এসে গেছে'। তারপর তিনি এক খণ্ড মেঘের দিকে তাকিয়ে বললেন, এই মেঘ খণ্ড খুযাআর সাহায্যের সুসংবাদ নিয়ে এসেছে। তারপর তিনি তাদেরকে জানালেন যে শীঘ্রই আবু সুফিয়ান সন্ধিচুক্তি নবায়ন করতে আসবে।

ঠিকই আবু সুফিয়ান চুক্তি নবায়ন করতে এলো। আবু সুফিয়ান এসে তার মেয়ে আল্লাহ্‌র রসূলের স্ত্রী উম্মুল মুমিনিন উম্মে হাবীবা রাঃ এর ঘরে গিয়ে বিছানায় বসতে গেলেন। অমনি উম্মে হাবীবা রাঃ সে বিছানা গুটিয়ে ফেললেন। আবু সুফিয়ান তার মেয়ের আচরণে বিস্মিত হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আমার কন্যা, এই বিছানা আমার উপযুক্ত নয় নাকি আমি এই বিছানার অযোগ্য? উম্মে হাবীবা রাঃ বললেন এটা স্বয়ং আল্লাহ্‌র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিছানা, আর আপনি একজন নাপাক মুশরিক।

কি এক আশ্চর্য ব্যপার! আপন পিতা মক্কার একজন প্রথম সারির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, বরং আবু জেহেলের মৃত্যুর পর সেই তো মক্কার শাসক, অঢেল সম্পদের মালিক বিশাল বিত্তবান। অথচ তাকে তার নিজ কন্যা এই ভাষায় সম্বোধন করছে যে আপনি একজন নাপাক মুশরিক! নিশ্চয়ই এমন শক্ত কথা নির্ভেজাল স্বচ্ছ আকীদা ও দৃঢ় বিশ্বাসের কারণেই তার পক্ষে বলা সম্ভব হয়েছিলো, অন্য কোন কারণে নয়।

আমাদের আজকের পৃথিবীর মুসলমানদের অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। আজকাল পিতার খাতিরে মুসলিমরা তার দ্বীনী ভাইয়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে অথচ আপনি দেখবেন তার সে পিতা হয়তো জাতিয়তাবাদী, সমাজতন্ত্রী কিংবা গণতন্ত্রী এবং ধূমপায়ী বে নামাযী। অথচ এমন পিতার পক্ষ নিয়ে সে তার দ্বীনী ভাইয়ের প্রতি অকারণ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ইসলামের সেই আকীদা বিশ্বাস কোথায়, কোথায় সে ঈমানী শক্তি কোথায় সে মুমিনের মর্যাদাবোধ?

অষ্টম হিজরীতে রমজান মাসে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা বিজয় করলেন। তারপর শাওয়াল মাসে তিনি হুনাইন যুদ্ধের অভিযানে গেলেন। তারপর তিনি তায়েফ অবরোধ করেন, কিন্তু তায়েফ বিজয় সেই অভিযানে সম্ভব হয়নি। তায়েফ যুদ্ধে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম *মিনজানিক*নিক্ষেপণযন্ত্র বা ক্ষেপনাস্ত্র প্রযুক্তি ব্যবহার করলেন। সালমান আল ফারসী রাঃ এর পরামর্শে তিনি এই প্রযুক্তি ব্যবহার করেন। তায়েফের সাকীফ গোত্রের লোকেরা বৃষ্টির মতো তীর নিক্ষেপ করতে লাগলে সাহাবায়েকেরামগনের বেশ কয়েকজন তীরবিদ্ধ হন, তাদের মধ্যে কয়েক জনের চোখেও তীর বিদ্ধ হন। আবু সুফিয়ান রাঃ যিনি মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করেন তিনিও এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং তারও চোখে কাফিরদের নিক্ষিপ্ত একটি শর বিদ্ধ হয় এবং তার চোখ কোটর থেকে বেরিয়ে যায়। তিনি চোখটি হাতে করে নিয়ে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ কাতাদা ইবন নুসায়রের মতো আমার চোখটিও আপনি ভালো করে দিন।

(সম্ভবত খায়বারের যুদ্ধে কাতাদা রাঃ এর চোখ কোটর থেকে বেরিয়ে এলে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা আবার তার কোটরের মধ্যে রেখে তাঁর মুবারক হাত মুছে দেন এবং এতে তার চোখ পূর্বের চেয়েও সুন্দর ও স্বচ্ছ হয়ে গিয়েছিলো।)

আবু সুফিয়ান রাঃ এর কথা শুনে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আপনি চাইলে আমি আপনার চোখ ভালো করে দিতে পারি, কিন্তু আপনি ইচ্ছে করলে আপনার এই চোখ হারানোর বিনিময় আল্লাহ্‌ তায়ালার কাছ থেকেও গ্রহণ করতে পারেন। আবু সুফিয়ান রাঃ বললেন, আমি আল্লাহ্‌র কাছ থেকেই এর বিনিময় পেতে চাই। এই বলে তিনি তার চোখটি নিজ পায়ের নিচে রেখে পিষে ফেললেন।

আবু সুফিয়ান রাঃ উত্তমভাবেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের সময় তিনি বেশ বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হয়ে পড়েছিলেন; তার বয়স সে সময় আশির কম ছিলো না। তিনি ইয়ারমুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু বয়সের ভারে ন্যুজ হয়ে পড়ার কারণে তিনি প্রত্যক্ষ লড়াইয়ে অবতীর্ণ হতে সক্ষম হননি। মহিলাদের সাথে তিনি যুদ্ধ ক্ষেত্রের পিছনে দাঁড়িয়েছিলেন; মুসলমানদের কোন সৈন্য যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পালিয়ে পিছনে গেলে তিনি লাঠি দিয়ে তাড়িয়ে রণক্ষেত্রে পাঠিয়ে দিতেন।

তাবুকের যুদ্ধ থেকে রসুলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় প্রত্যাবর্তন করার পর সূরা বারাআহ অবতীর্ণ হয়। অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাইতুল্লাহকে তথা গোটা মক্কাকে মূর্তির অপবিত্রতা থেকে পবিত্র করেন। তিনি আত্তাব ইবন্ উসাইদ (রাঃ)-কে মক্কার শাসক নিয়োগ করেন। আত্তাব (রাঃ)

ছিলেন অত্যন্ত সৎ ও পরহেযগার প্রকৃতির মানুষ। সে বসর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজ্জ আদায় করেন এবং আত্তাব ইবন্ উসাইদ (রাঃ)-ও সে বসরই হজ্জ করেন।

নবম হিজরীতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পবিত্র হজ্জের আনুষ্ঠানিকতাসমূহকে মুশরিকদের থেকে এবং বিবস্ত্র লোকদের থেকে পবিত্র করতে চাইলেন। কারণ আরবের মুশরিকরা বিবস্ত্র হয়ে বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করতো এবং বলতো, যে কাপড় পরে আমরা আল্লাহ্র অবাধ্য হয়েছি, তা পরিধান করে আমরা কিভাবে তাওয়াফ করবো! তাই কারো সামর্থ্য থাকলে কুরাইশদের থেকে কাপড় ভাড়া নিয়ে তা পরিধান করে তাওয়াফ করতো এবং তাওয়াফ শেষ করে তা আবার ফিরিয়ে দিত। আর যাদের সামর্থ্য ছিলো না তারা বিবস্ত্র হয়ে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করতো।

কিন্তু সেই প্রাচীন জাহেলী যুগের বিবস্ত্র হওয়া তথাকথিত এই আধুনিক নব্য জাহেলী যুগের বিবস্ত্র হওয়ার মতো একই বিষয় নয়। তারা বিবস্ত্র হত ভ্রান্ত বিশ্বাসে ও শয়তানের প্ররোচনায়। তারা বিবস্ত্র হলেও তাতে একটা ধর্মীয় আমেজের ছোঁয়া থাকতো! কারণ তারা বলতো, যে কাপড় পরিধান করে আল্লাহ্র অবাধ্য হয়েছি, সেই একই কাপড় পরিধান করে কিভাবে বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করবো। তদুপরি সেখানে কোন অবাধ মেলামেশা ছিল না। দিন শেষে যখন চারদিকে রাতের অন্ধকার ছেঁয়ে পড়তো, তখন মহিলারা বিবস্ত্র হয়ে তাওয়াফ করতো।

আর বলতো- 'আজ শরীরের কিছু অংশ অথবা গোটা শরীর বিবস্ত্র হয়ে যাবে। তাই বলে আমি তা পর পুরুষের জন্য বৈধ করে দিব না'।

এটা হল প্রাচীন জাহেলিয়াতের কথা। কিন্তু আজকের এই তথাকথিত আধুনিক জাহেলিয়াতের কথা কি কেউ চিন্তা করে দেখেছেন? প্রতিদিন এসব কি হচ্ছে। বেহায়াপনা, বেলেল্লাপনা, উলঙ্গপনা ও নির্লজ্জতার কি কোন শেষ আছে! খুন, ধর্ষণ, অপহরণ ইত্যাদির কি কোন মাত্রা আছে?

প্রাচীন সে জাহেলী যুগে নারীদের মাঝে আত্মমর্যাদাবোধ, চারিত্রিক সূচিতা ও মানবতাবোধ যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। আরবের প্রসিদ্ধ কবি আনতারার সম্ভ্রমের কথা একটু চিন্তা করে দেখুন। তিনি তার কবিতার ছন্দে বলেন-

'আমি আমার আঁখি বন্ধ করে ফেলি, যতক্ষণ না আমার প্রতিবেশীনী তার ঘরের অন্দর মহলে অদৃশ্য হয়ে যায়।'

আর এই তো প্রেম-জগতের কিংবদন্তি কায়েস তার প্রিয়সী লায়লাকে বলছে, 'আমাকে একটিবার চুমু খাও'। উত্তরে লায়লা বলল, না আমি তোমাকে চুমু খাব না। তারপর কায়েস বলল, আল্লাহ্র কসম করে বলছি, যদি তুমি সত্যিই আমাকে চুমু খেতে, তাহলে তরবারীর আঘাতে আমি তোমাকে দু'টুকরো করে ফেলতাম।

তাদের মাঝে চারিত্রিক পরিচ্ছন্নতা, পবিত্রতা, সূচীতা ও আত্মমর্যাদাবোধ ছিল হিমালয় সমান।

ঐ মহিলার কথা চিন্তা করে দেখুন, যার মাধ্যমে হাতেব ইবনে আবী বালতাআ কুরাইশদের কাছে গোপনে চিঠি পাঠিয়েছিলেন। তখন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলী এবং জুবাইর (রাঃ)-কে ঐ মহিলার সন্ধানে পাঠালেন। পথেই আলী (রাঃ) সেই মহিলাকে পেয়ে বললেন, চিঠিটি বের করে দাও।মহিলা বলল, আমার সাথে কোন চিঠি নেই। তখন আলী (রাঃ) ধমক দিয়ে বললেন, **যদি চিঠি বের করে না দাও, তাহলে আমি তোমার মাথা আবরণমুক্ত করে ফেলবো**। এটাই ছিল সেকালের চূড়ান্ত হুমকি।

মক্কা বিজয়ের পর আবূ সুফিয়ান (রাঃ)-এর স্ত্রী হিন্দ যখন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বাইয়াত গ্রহণ করতে এল তখন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করে শুনালেনঃ

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لاَ يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلاَ يَسْرِقْنَ وَلاَ يَزْنِينَ وَلاَ يَقْتُلْنَ أَوْلاَدَهُنَّ وَلاَ يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلاَ يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (الممتحنة: 12).

হে নবী! যখন মু’মিন নারীরা আপনার নিকট এই মর্মে বাইয়াত গ্রহন করতে আসবে যে, তারাআল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরিক করবে না, চুরি করবে না এবং যিনা করবে না ....।
(সূরা মুমতাহিনা, আয়াত ১২)

তখন হিন্দ বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ! একজন স্বাধীনা নারী কি কখনো যিনা করতে পারে?
তিনি অত্যন্ত বিস্মিত ও আশ্চর্য হয়েই এ প্রশ্নটি করেছিলেন। তারা মুশরিক ছিল, অজ্ঞ ছিল কিন্তু তাদেরমাঝে আখলাক ছিল, উন্নত গুনাবলী ছিল। উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিল তারা।
এবার নব্য আল্লাহ্‌দ্রোহীদের চরিত্রের দিকে তাকাও। মিসরের জামাল আব্দুন নাসের কত জঘন্য চরিত্রেরছিলো দেখো। ইসলামী আন্দোলনের কোন কর্মীকে যখন তার
লোকেরা গ্রেফতার করে আনতো তখনসাথে সাথে তার সহোদরা বোনকেও নিয়ে আসতো। তারপর ভাইয়ের সামনে তার বোনের ইজ্জত হরণকরতো। আর জেলার হামযা বাসুনীর বেহায়াপনার কথা লিখতে তো আর কলম আগায় না। কারাগারের
মধ্যে সহোদর দুই ভাইকে ঐ নরাধম পরস্পর সমকামীতায় লিপ্ত হতে বাধ্য করতো; নতুবা তাদের উপরচলতো কঠিন অত্যাচার। এভাবে মিসরের জেলে যে কত নারী তার ইজ্জত হারিয়েছে তার হিসাব কেরেখেছে। জয়নব গাযালী তার গ্রন্থ *‘আইয়ামুম মিন হায়াতী’* (বাংলায় ‘কারাগারে রাত-
দিন’ নামে গ্রন্থটিপ্রকাশিত হয়েছে) এর মাঝে তা বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, ‘আমি দাড়াতে পারতাম না; প্রয়োজনে হামিদা কুতুবের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতাম। অসুস্থতার কারণে তিনি আমাকে ধরে নিয়ে যেতেন। কারণ আমি কারারুদ্ধ অবস্থায় পাঁচ বসরে পাঁচ মিনিটের জন্যও ঘুমাতে পারিনি।
তিনি বলেন, একদিন তারা আমার নিকট একজন পুলিশ পাঠালো। হামযা বাসুনী তাকে বলে সামনে যাও,আর সে পিছিয়ে যায়। আবার বলে সামনে যাও, আর সে পিছিয়ে যায়। তারপর লোকটি কেঁদে ফেললোএবং হামযা বাসুনীর সামনে থেকে দৌড়ে পালিয়ে গেলো। এর পর তারা আরেকজন লোক নিয়ে এলো ।হামযা বাসুনী বলল, যাও। সে আমার সেলে প্রবেশ করলো।
সে বলল, ‘কাজ’ চালাও। যয়নব আলগাজালী বলেন, আমি দাড়িয়ে গেলাম। আমার মন ও শরীরে অসাধারণ সাহস ও শক্তি অনুভব করলাম।আল্লাহ
আমাকে সাহায্য করলেন। আমি তার ঘাড়ে কামড়ে ধরলাম। লোকটি ওজনে নেবড়ার মত মনেহলো। আমি তাকে ধরে ছুড়ে মারলাম, যেন সে কমলালেবুর বিচি। তিনি বলেন, আমি পশুটিকে আমার সেলেই মেরে ফেললাম।
এ হল নব্য জাহেলিয়াতের আখলাক-চরিত্র। এ হল এ
যুগের আল্লাহ্‌দ্রোহীদের চরিত্র। হাফিজ আল আসাদতো যিনা করার উদ্দেশ্যে কুমারী মেয়েদের জেলে আবদ্ধ করতো। আর পুতঃপবিত্রা মেয়েরা কারা প্রকোষ্ঠথেকে মুসলিম মুজাহিদ ভাইদের নিকট পত্র পাঠাতো। এসো হে মুজাহিদ ভাইয়েরা! আমাদের গর্ভের অবৈধভ্রুন বড় হতে শুরু করেছে; এসো, আরো কিছু ঘটার পূর্বেই এই কারা প্রকোষ্ঠ ধ্বংস করে দাও।
এ হল সমাজবাদী, জাতীয়তাবাদী ও
গণতান্ত্রিক বিপ্লবীদের চরিত্র। এ হল প্রগতিবাদীদের নখরাঘাতেক্ষতবিক্ষত মানুষের রক্তাক্ত ক্ষতস্থান।

সার কথা হলো, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
বাইতুল্লাহকে বিবস্ত্র তাওয়াফকারী ওমুশরিকদের অপকর্ম থেকে পবিত্র করতে চাইলেন। আর এ মর্মে সূরা বারাআ-
এর চল্লিশটি আয়াত অবতীর্ণহয়েছিল। তখন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে আয়াতগুলোসহ আলী (রাঃ)-
কে মক্কায় প্রেরণকরলেন। পূর্বেই তিনি আবু বকর (রাঃ)-
কে হাজীদের আমির নিযুক্ত করে পাঠিয়েছিলেন। তিনি আলী(রাঃ)-
কে আয়াতগুলো দিয়ে বললেন, আবু বকরের সাথে গিয়ে মিলিত হও এবং সমস্ত হাজীদের সামনে এআয়াতগুলো পাঠ
করে শুনিয়ে দাও। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলী (রাঃ)-
কে এ কারণেপাঠালেন যে, আরবদের মাঝে প্রচলিত নিয়ম ছিল, যে ব্যক্তি কোন চুক্তিতে বা প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হয়েছে,সে নিজ বা তার নিকটাত্মীয় ছাড়া অন্য কেউ সেই চুক্তি ভঙ্গ বা বাতিল করলে তা কার্যকরী হত না। তাই রসূল (সাঃ) আলী (রাঃ)-কেই এ দায়িত্ব পালনের জন্য নির্বাচিত করলেন।
আলী (রাঃ) যখন এসে আবু বকর (রাঃ)-
এর সাথে মিলিত হলেন তখন আবু বকর (রাঃ) ভড়কে গেলেন।তিনি ভাবলেন, (কোন ভুল ত্রুটির
কারণে) হয়তো তাকে হজ্জের আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালন থেকে অব্যহতি
দিয়ে কোন ওহী অবতীর্ণ হয়েছে; তাই রাসূল (সাঃ) তার বদলে আলী (রাঃ)-
কে আমীর বানিয়েপাঠিয়েছেন। আতঙ্ক ভরা কণ্ঠে তিনি আলী (রাঃ)-
কে জিজ্ঞাসা করলেন, আমীর হয়ে এসেছো না মামূর(অধীনস্ত) হয়ে? আলী (রাঃ) বললেন, মামূর হয়ে। তখন আবু বকর
(রাঃ) শান্ত হলেন। আলী (রাঃ) বলেন,চারটি বিষয়ের ঘোষণা দেয়ার জন্য রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়া সাল্লাম আমাকে প্রেরণ করেছেন।
যায়দ বিন নুফাইল (রহঃ) বলেন, আমি আলী (রাঃ)-কে জিজ্ঞাস করেছিলাম, কী
উদ্দেশ্যে আপনাকে হজ্জেপ্রেরণ করা হয়েছিলো? আলী (রাঃ) বললেন, চারটি কারণে (চারটি হুকুম সকলকে শুনিয়ে
দিতে)।

১. বিবস্ত্র হয়ে আর কেউ কখনো বাইতুল্লাহ্ তাওয়াফ করতে পারবে না।
২. যার সাথে নবী (সাঃ)-
এর কোন চুক্তি আছে, তা তার মেয়াদ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। আর চুক্তিনাথাকলে তাদেরকে চার মাসের অবকাশ দেয়া হল।
৩. মু'মিন পুরুষ ও নারী ছাড়া কেউই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।
৪. এই বসরের পর মুসলমান ও মুশরিকরা হজ্জে একত্রিত হতে পারবে না। অর্থাৎ মুশরিকরা আরহজ্জ পালন করতে পারবে না। (তিরমিযী)

এমনই ঘটলো। নবম হিজরীতে আলী (রাঃ) আরাফার দিনে, কুরবানীর দিনে, যুলহজ্জ মাসের বার তারিখেএই ঘোষণা সকল হাজীদেরকে জানিয়েছিলেন।

بَرَاءةٌ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ
'মুশিরকদের মধ্য থেকে তোমরা যাদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ রয়েছো, তাদের থেকে আল্লাহ্ তায়ালা ও তার রাসূল মুক্ত'।
অর্থাৎ চুক্তি শেষ হয়ে গেছে। সুতরাং চার মাস তোমরা এই ভূমিতে (আরব উপদ্বীপে) নির্বিঘ্নে ঘোরাফেরাকরতে পারো। অর্থাৎ জ্বিলহজ্জের দশ তারিখ হতে রবিউস সানীর দশ তারিখ পর্যন্ত তোমাদের অবকাশদেয়া হলো। এ সময়ের মধ্যে তোমরা যেখানে ইচ্ছা যেতে পারবে; তোমাদের সাথে কেউ যুদ্ধ করবে না।সুতরাং কেউ ইচ্ছা করলে আরব উপ

দ্বীপের বাইরে চলে যেতে পারো, আর কেউ ইচ্ছে করলে যুদ্ধের প্রস্তুতিনিতে পারো। এ চার মাস পর তোমাদের বিরুদ্ধে যথার্থ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এভবেই আলী (রাঃ) নবম হিজরীতে হজ্জের মওসুমে মুমিন-মুশরিক নির্বিশেষে সকলকে এই ঘোষনাশুনিয়ে দেন।

আমি পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, সূরা বারাআ বা সূরা তাওবার অনেকগুলো নাম রয়েছে। এ নামসমূহের মধ্যে *আল ফাজিহা* ও *আল বুহূস* নামটি অন্যতম। *ফাজিহা* অর্থ অপমানকারী, মুখোশ উন্মোচনকারী এবং *বুহূস* অর্থ আলোচনা। এ সূরায় মুনাফিকদের পরিচয় তুলে ধরে তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করা হয়েছে।

প্রসিদ্ধ এক তাবেয়ী বলেন, আমি মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রাঃ)-কে দেখলাম, তিনি হিমসে এক মুদ্রাবিনিময়কারীর দোকানে বসে আছেন। তিনি তখন বেশ মোটা হয়ে গিয়েছিলেন। আমি তাকে বললাম,আপনি কি এই বসর জিহাদে অংশগ্রহণ বাদ দিবেন- শুধু এই এক বসর? তিনি বললেন-তুমি কি সূরা বুহূসকে অস্বীকার করলে? তুমি কি সূরা তাওবাকে প্রত্যাখ্যান করলে? অথচ সে সময় জিহাদফরজে কিফায়া ছিলো। কারণ তখন জিহাদ হচ্ছিলো নতুন অঞ্চল বিজয় করার জন্য। মুসলমানদেরহাতছাড়া হয়ে যাওয়া ভূখণ্ড উদ্ধারের জন্য জিহাদ হচ্ছিল না। তা সত্ত্বেও মিকদাদ (রাঃ) বলেছিলেন, তুমিকি সূরা বুহূসকে অস্বীকার করছো, যে সূরায় আল্লাহ্ তা'য়ালা মুনাফিকদের কুচরিত্রের আলোচনা প্রসঙ্গেবলেছেন, তারা জিহাদে অংশগ্রহন না করার ব্যাপারে নানা ওজর-আপত্তি তালাশ করে।

সূরা তাওবা মদীনায় অবতীর্ণ (বিধি বিধান সম্বলিত) সর্বশেষ সূরা। নবম হিজরীর রজব মাসে তাবূকঅভিযানের শুরুতে, মধ্যে এবং শেষে অবতীর্ণ হয়েছে এই সূরা। তাই এ সূরা থেকেই জিহাদ সংক্রান্তসর্বশেষ ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তমূলক বিধি-বিধান গ্রহন করতে হবে, যে বিধি-বিধান কিয়ামত পর্যন্ত আরপরিবর্তন হবে না।

শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই সূরাটি পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই, তাতে মৌলিকভাবে ছয়টিবিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম বিষয়ঃ শুরুর আটাশটি আয়াতে আরব উপদ্বীপের সকল মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করাহয়েছে। যাদের সাথে মুসলমানদের চুক্তি রয়েছে, মেয়াদ পর্যন্ত তাদের চুক্তি বলবৎ রাখার হুকুম দেয়াহয়েছে। নতুন কোন চুক্তি সম্পাদন করতে নিষেধ করা হয়েছে, আর যুদ্ধ ঘোষণায় এতটুকু অনুকম্পাপ্রদর্শন করা হয় যে, তাদেরকে চার মাসের অবকাশ দেয়া হয়েছে। এ চার মাসের মধ্যে তারা হয়ইসলামের সত্যতা বুঝে ইসলাম গ্রহণ করবে, অন্যথায় আরব উপদ্বীপ ছেড়ে যেখানে খুশি চলে যাবে।কারণ তখন পর্যন্ত দূর্বল ঈমান মুসলমানদের সাথে কাফিরদের বিভিন্ন রকম সামাজিক অর্থনৈতিক সম্পর্কবিদ্যমান ছিল। মুসলমান ও মুশরিকদের মাঝে বিদ্যমান সকল সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য আল্লাহ্ তা'য়ালাএই নির্দেশ প্রদান করেন।

দ্বিতীয় বিষয়ঃ আহলে কিতাব অর্থাৎ ইহুদী ও খৃস্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ঐতিহাসিকবাস্তবতা, বিশ্বাসগত বৈপরিত্ব ও বাস্তবতার নিরিখে এ ঘোষণা দেয়া হয়। তাছাড়া মুশরিকদের সাথেমুসলমানদের দীর্ঘ দিনের বিভিন্ন প্রকার আত্মীয়তা ও বন্ধুত্ব ইত্যাদি সম্পর্ক বিদ্যমান থাকার কারণে তাদেরবিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হত না, তেমনিভাবে আহলে কিতাবদের সাথে যুদ্ধ করতেও মনে নানা প্রশ্ন জেগেউঠত। একটা ভয় সৃষ্টি হত। মন বলতো, কিভাবে আহলে কিতাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো অথচ তাদেরনিকটও তো আল্লাহ্‌র প্রেরিত কিতাব রয়েছে। তারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে, পরকালে বিশ্বাস করে, ঈসা(আঃ)-এর প্রতি ঈমান রাখে। কুরআন তাদের মনের এই সংশয় দূর করে দিয়ে বলেছে, অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে

হবে। কেননা যখন পর্যন্ত স্পষ্টভাবে জানা না যায় যে, যার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাচ্ছি সে নিশ্চিত কাফির ততোক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ প্রচন্ড আকার ধারন করে না।

মুজাহিদ ভাইয়েরা প্রায়ই আমার নিকট এসে জিজ্ঞাসা করে, কমিউনিষ্টদের সাথে যে সব মুসলমান সেনাআছে আমরা তাদের বিরুদ্ধে কিভাবে যুদ্ধ করবো, তাদের শিবির থেকে আজানের আওয়াজ ভেসে আসতেশুনি, তাদেরকে পাঁচ ও য়াক্ত নামাজ আদায় করতে দেখি। সুতরাং কিভাবে এসব শিবিরে আক্রমন করবো?যতক্ষণ পর্যন্ত এ মাসআলার একশ ভাগ নিশ্চয়তার সাথে উত্তর জানা না যাবে যে, তাদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধকরা ফরয, ততক্ষণ পর্যন্ত অন্তরে একটা দ্বিধা থেকেই যাবে। তাই আমি তাদেরকে বলছি, যদি কমিউনিষ্টশিবিরে সবাইও মুসলমান হয়, তবুও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ফরয। কারণ তারা ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ
করেছে। তারা মুসলমানদের উপর আক্রমন করে তাদের ধন সম্পদ ছিনিয়ে নিচ্ছে, নির্বিচারে তাদের হত্যা করছে। মুসলিম নারীদের ইজ্জত হরণ করছে। নামে মুসলমান হলেও এ ধরনের মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অধিকাংশ ফিকাহবিদের মতে ফরয; কতিপয়ের নিকট শুধু বৈধ।

কেউ
বলতে পারে যে, তারা তো বাধ্য হয়ে অনিচ্ছাকৃতভাবে সেখানে আছে এবং যা করছে তা বাধ্য হয়েইকরছে। তাহলে আমি বলবো, তাদের কাজ কি? তাদের কাজ হল কুফুরী শক্তির সহায়তা করা।

রুশবাহিনীর শিবির হেফাজত করা। মুজাহিদদের চলাচলের পথ ছিন্ন করা, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণকরা। অতএব যারা এসব কাজ করবে তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই নির্দ্বিধায় যুদ্ধ করতে হবে, তাতে তাদের পরিচয় যা-ই হোকনা কেন। আমি এ ধরণের লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের স্বপক্ষে নয়টি দলীল উপস্থাপনকরেছি। তাছাড়া প্রশ্ন
হলো, যদি তাদের মোকাবেলায় যুদ্ধ না করি, তাহলে তাদের কারণে অমুসলিমশত্রুদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ পরিহার করতে হবে; কারণ তারা তো পরস্পর একইসাথে
রয়েছে। ফলে এই শত্রুরাএই কমিউনিষ্টরা নিরাপদে থেকে একের পর পর মুসলমনদের হত্যা করতেই থাকবে। তারা জনপদের পরজনপদ ধ্বংসস্তুপে পরিণত করবে। তাদেরকে এই কাজ করতে সুযোগ দেয়ার পক্ষে কি কেউ কোন যুক্তি উপস্থাপন করতে পারে? কক্ষনোই নয়; অতএব ঐসব মুসলমান দাবীদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ছাড়া কোন উপায় নেই।

এজন্য ইমাম
ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) তাতারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে দ্বিধা দ্বন্ধে নিপতিত মুসলমানদের লক্ষকরে বলেছিলেন, যদিও তাতারীদের মধ্যে মুসলমান রয়েছে, তারা নামায আদায় করে, রোযা রাখে, তবুওতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। শুনে রাখ, যদি তোমরা আমাকেও তাতারীদের সাথে দেখ, আর আমারমাথায় তখন কুরআনও থাকে, তাহলে তোমরা আমাকেও নির্দ্বিধায় হত্যা করবে। এভাবেই তিনি এমাসআলাটি মুসলমানদের নিকট সাহসের সাথে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছিলেন।

যদি শত্রুরা মুসলমান নারী, শিশু ও বন্দিদেরকে রণক্ষেত্রে মানবঢাল রূপে ব্যবহার করে, তবুও তাদেরবিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে। এতে মানবঢাল হিসেবে ব্যবহৃত মুসলমানদের ক্ষতি, এমনকি নিহত
হওয়ারও পরোয়া করা যাবে না। এক্ষেত্রে মুসলমানরা নিহত হলে রক্তপণ দেয়া ওয়াজিব হবে না।

তৃতীয় বিষয়ঃ যারা জিহাদে অংশগ্রহণ না করে পিছনে থেকে যায়, তাদেরকে হুঁশিয়ারী করা হয়েছে।তিরস্কার করা হয়েছে। বলা হয়েছে-

ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض

'কী হলো তোমাদের! যখন তোমাদের বলা হয় তোমরা আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদে বেরিয়ে পড়োতখন তোমরা ভারী হয়ে মাটির সাথে লেগে যাও! .... (তাওবা, আয়াত ৩৯-৪০)

চতুর্থ বিষয়ঃ মুনাফিকদের চরিত্র ও পাপাচারের আলোচনা। প্রায় অর্ধ সূরা পর্যন্ত এ বিষয়ে আলোচনাকরা হয়েছে। বলা হয়েছে-

*আর তাদের কেউ আল্লাহ্‌র নিকট প্রতিশ্রুতি দিয়েছে......... আয়াত ৭৫

*তাদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে যারা নবীকে কষ্ট দেয়........... আয়াত ৬১

*তাদের কেউ কেউ বলে আমাকে (জিহাদে না যাওয়ার) অনুমতি প্রদান করুন আরআমাকে পরীক্ষায় ফেলবেন না .... আয়ার ৪৯

*আর যারা (মুসলমানদের) ক্ষতি ও কুফুরীর উদ্দেশ্যে একটি মসজিদ নির্মাণ করেছে ...... আয়াত ১০৭

এভাবে সূরাটির প্রায় অর্ধেক অংশ জুড়ে মুনাফিকদের স্বভাব চরিত্র ও কূমতির আলোচনা করা হয়েছে।তাই এ সূরার নাম *বুহূস*(আলোচনা) রাখা হয়েছে। কারণ এ সূরা মুনাফিকদের স্বভাব, দোষ চরিত্র ওকূমতির আলোচনা সম্বলিত সূরা। ইবন্ আব্বাস (রাঃ) বলেন-

ما زالت آيات التوبة تنزل وتقول ومنهم ومنهم حتى قلنا لا تدع أحدا

'একের পর এক সূরা তাওবার আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়ে 'তাদের কেউ' 'তাদের কেউ' বলে মুনাফিকদেরঅবস্থা ও চরিত্র বর্ণনা করতে লাগলো। এমনকি আমরা বলতে লাগলাম এ সূরা তো কাউকেই ছাড়বে না'।

এভাবে মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র, মুসলিম সমাজে অনুপ্রবেশ, ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করা, জিহাদ থেকেমুসলমানদেরকে নিরুৎসাহিত করা- এগুলো ছিল সে যুগের মুনাফিকদের চরিত্র। এ যুগের মুনাফিকদেরওঠিক একই চরিত্র। জিহাদ সম্পর্কে অপপ্রচার করা, মুজাহিদদের দোষ ও কুৎসা গেয়ে বেড়ানো, জিহাদের ব্যাপারেমুসলমানদের নিরুৎসাহিত করা- এগুলো এখনো মুনাফিকদের চরিত্র; যদিও এসব কথা আজকাল অনেকসময় অনেক মুখলিস মুসলমানকেও বলতে শোনা যায়। তবে যতোই মুখলিস হোক কাজ যদি একই ধরণের হয় সেক্ষেত্রে একই হুকুম প্রযোজ্য হবে। এ ধরনের লোকদের থেকে মুসলিমদের হুঁশিয়ারী করেআল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

'যদি তোমাদের সাথে তারা জিহাদে বের হত তবে তারা তোমাদের কষ্ট ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করতো না;আর তোমাদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ছোটাছুটি করতো'...... আয়াত ৪৭।

এদের ব্যাপারে ভয় থাকলেও তেমন বেশী ভয় নেই; বরং প্রকৃত ভয় ঐ মুসলমানদের নিয়ে যাদের সম্পর্কেআল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

'আর তোমাদের মাঝে তাদের গুপ্তচর রয়েছে, যদিও আল্লাহ্ যালিমদের ব্যাপারে খুব ভাল জানেন......... আয়াত ৪৭

ভয় ঐ যুবকদের নিয়ে যারা জর্দান, মিসর বা সৌদী আরবসহ বিভিন্ন দেশ থেকে জিহাদের প্রেরণায়উজ্জীবিত হয়ে জিহাদে অংশগ্রহণের জন্য আসে। পেশোয়ারে পৌঁছলে তারা গ্রেফতার করা হয় এবং জিহাদ সম্পর্কে নেতিবাচক ও বিষাক্ত কথা বলে তাদেরকে জিহাদের ময়দানে যেতে না দিয়ে সেখান থেকেইফিরিয়ে দেয়া হয়। আর এরা ফিরে গিয়ে তাদের শিখিয়ে দেয়া বুলি আওড়ে বেড়ায়। বলে, জিহাদ শেষহয়ে গেছে। এদেরকেই আল্লাহ্ তা'আলা যালিম বলে অভিহিত করেছেন।

তাই ফিকহ্ বিশারদ আলেমগণ এ ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, মুসলিম রাষ্টনায়ক বা সেনাপ্রধানের জন্য পরিবেশ বিনষ্টকারী ফিতনা সৃষ্টিকারী ও সৈন্যদের মনোবল ধংসকারী প্রকৃতির লোকদেরকে মুসলিম সেনাবাহিনীর সাথে জিহাদে যাওয়ার অনুমতি প্রদান বৈধ নয়। এ ধরণের লোকেরাই বলে বেড়ায়আফগানিস্তান

মুনাফিকে ছেঁয়ে গেছে, আর মুজাহিদরা মুশরিক হয়ে গেছে৷ সেখানে বিদআতের শেষ নেই৷এ ধরনের লোকদের জিহাদে অংশগ্রহণের আনুমতি দেয়া বৈধ নয়৷ তাদের ব্যাপারে কুরআনের বিধানহল-

فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا
‘আর যদি আল্লাহ্ আপনাকে তাদের কোন দলের নিকট ফিরিয়ে নেন এবং তারা
যদি আপনারকাছে জিহাদে বের হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করে, তাহলে আপনি বলে দিন, তোমরা কখনোই আমার সাথে বের হবে না এবং আমার সাথে শত্রুর মুকাবেলায় যুদ্ধ করবে না’। (সূরা তাওবা, আয়াত ৮৩)
যারা মুজাহিদদের সম্পর্কে মিথ্যা ও বানোয়াট সংবাদ ছড়ায় আর বলে, কাফিরদের বাহিনী প্রচন্ডশক্তিশালী৷ যুদ্ধের ময়দানে গেলে তোমরা খতম হয়ে যাবে; সেখানে তোমাদের মৃত্যু অবধারিত৷ তোমরাতো পাগল হয়ে গিয়েছো, গোটা বিশ্বের সুপার পাওয়ার রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাও!
তোমাদেরমাথায় কি ঘিলু আছে? এদেরকেই বলা হয় *‘মুরজিক’৷ (শায়েখ এখানে রাশিয়ার কথা বলছেন কারণ শায়খের জীবদ্দশায় আফগান যুদ্ধ চলছিলো রাশিয়ার বিরুদ্ধে; শায়েখ যদি এখন বেচে থাকতেন তাহলে নিশ্চয়ই রাশিয়ার স্থানে আমেরিকান নাম বলতেন)*
আর যারা যুদ্ধের ময়দানে যাওয়া থেকে মানুষকে ময়দানের কষ্টের কথা
বলে নিরুৎসাহিত করতে থাকে যে,প্রচন্ড গরম, ভীষন শীত বা চারিদিকে বরফ, দিনরাত শুধুই তুষারপাত হচ্ছে ইত্যাদি। এরা হল ‘মুখযিল’।
শরীয়তের বিধান হল, এ দু’শ্রেণীর মানুষকে ময়দানে যেতে না দেয়া৷
পঞ্চম বিষয়ঃ মদীনার মুসলমানদের বিভিন্ন স্তরে বিভক্তির আলোচনা৷ ১.মুনাফিক ২. কাফির ৩. দুর্বলমু’মিন ৪. মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামী মুসলিমগণ৷
সর্বশেষ এ প্রকারেরমুসলিমগণ ফেরেশতাদের চেয়েও উত্তম৷ এ মর্মে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকীদা হল, সাধারণমুসলিমগণ সাধারণ ফেরেশতাদের
চেয়ে উত্তম আর বিশিষ্ট মুসলিমগণ বিশিষ্ট ফেরেশতাদের চেয়ে উত্তম৷এ চার ধরণের লোক তখন মদীনায় বাস করতো।
ষষ্ঠ বিষয়ঃ ইসলাম গ্রহণ ও রাসূলের হাতে বাইয়াত গ্রহণের দাবী ও চাহিদা সম্পর্কে আলোচনা করাহয়েছে৷ এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা’আলা বলেন-

إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة
‘নিশ্চয় আল্লাহ্ মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন, এর বিনিময়ে যে,তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত৷ তারা আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করবে, হত্যা করবে এবং নিহত হবে৷ (আয়াত ১১১)
এ ধরনের মুসলমানের প্রকৃতি হল যে, তারা কখনো আল্লাহ্র রসূলের সঙ্গ ত্যাগ করবে না৷ রাসূল যা-ইবলেন, তাই নির্দ্বিধায় পালন করে৷ এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা’আলা বলেন-

ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه
‘মদীনাবাসী ও পার্শ্ববর্তী পল্লিবাসীদের উচিত নয় রাসূলুল্লাহর সঙ্গ ত্যাগ করে পশ্চাতে থেকেযাওয়া এবং রসূলের প্রান থেকে নিজেদের প্রানকে অধিক প্রিয় মনে করা৷ (আয়াত ১২০)

কিন্তু এখন যে বিষয়টি জানা সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন, তা হল মদীনার অধিবাসীরা কিভাবে এতো ভাগেবিভক্ত হয়ে পড়লো, অথচ মক্কায় তো এমন ছিল না? কারণ মদীনার নগরী ও এর

আশপাশে যারা বাসকরতো তাদের মাঝে মুনাফিক ছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

'আর পল্লিবাসীদের মধ্যে থেকে আপনারআশেপাশে কিছু মুনাফিক রয়েছে, আর কিছু মদীনাবাসী মুনাফিকীতে অনড়'...... আয়াত ১০১। অন্যত্রআল্লাহ্ তায়ালা বলেন-

'পল্লির বেদুইনরা কুফর ও মুনাফিকীতে অত্যন্ত কঠোর'...... আয়াত ৯৭। আবারমদীনার পল্লি বেদুইনদের মাঝে ন্যায়নিষ্ঠ মুসলমানও ছিল। তাদের প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

'আরবেদুইনদের কতক আল্লাহর প্রতি ও পরকালের প্রতি ঈমান আনে এবং নিজেদের ব্যয়কে আল্লাহর নৈকট্য এবং রাসূলের দু'আ লাভের উপায় গণ্য করে...... আয়াত ৯৯

সুতরাং মদীনায় মুমিনদের সাথে মুনাফিকরাও বসবাস করতো। কিন্তু সাহাবাদের মক্কী জীবনে কোনমুনাফিক ছিল না। প্রশ্ন

হলো মদীনায় মুনাফিকদের বিকাশ কিভাবে হলো। হ্যাঁ, স্বার্থ ও ফায়দা হাসিলেরসন্ধানেই মানুষ মুনাফিক হয়। মক্কায় ইসলাম গ্রহণের সাথে বৈষয়িক স্বার্থ লাভের কোন সুযোগ তো ছিলইনা;

বরং যারাই ইসলাম গ্রহণ করতো, কালেমা তাইয়্যেবার সাক্ষ দিতো তাদের ভোগ করতে হত বিভিন্নপ্রকারের মর্মন্তুদ শাস্তি, হৃদয় বিদারক নির্যাতন ও নিপীড়ন। মক্কার কাফিরদের নির্যাতন ও নিপীড়নের হাতথেকে কোন মুসলিমই রেহাই পায়নি। এমনকি স্বয়ং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও রেহাইপাননি। দিনের পর দিন তাঁকে অর্ধাহারে অনাহারে কাটাতে হয়েছে।

বিলাল (রাঃ)-

এর উপর নির্যাতন নিপীড়নের কথা একটু চিন্তা করে দেখুন। মরু আরবের বালু যখন রোদেউত্তাপে আগুন হয়ে যেত তখন তাকে সেই উত্তপ্ত বালিতে শুইয়ে দিয়ে তার বুকে বিরাট পাথর রেখে চাপাদিয়ে

রাখা হত। তাকে লাত ও ওয্যার পূজায় ফিরে আসায় উৎসাহিত করা হত আর শাস্তি দেয়া হত। কিন্তুতিনি শুধু মাত্র 'আহাদ, আহাদ' করতেন। তিনি বলতেন আমি এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদতকরবো না। এই প্রতিধ্বনিই শুধু দিয়ে যেতেন। বিলাল (রাঃ)-

এর এই যে কঠিন সময়ে আহাদ আহাদ বলাতো কোন আকল বা বুদ্ধির কথা না। এটা ছিল তার প্রানের কথা। বুদ্ধির কথা তো ছিল, তিনি উমাইয়াকে ধোঁকা দিয়ে নির্যাতন থেকে বেঁচে যেতেন আর রাতের অন্ধকারে রাসূলের নিকট এসে বলতেন, আমি উমাইয়াকে ধোঁকা দিয়েছি। আমি মূর্তি পূজায় ফিরে যাইনি। আমি তাওহীদের সাক্ষ্য দিচ্ছি।

মনে রাখতে হবে, ইসলামের দাওয়াত কখনো প্রতারণা, কপটতা আর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বিজয় লাভ করেনা। জাহিলদের সামনে সুস্পষ্ট ভাষা য় আল্লাহ্ ও আল্লাহ্

র রাসূলের হুকুম ব্যক্ত করার মাধ্যমেইইসলামের দাওয়াত বিজয় লাভ করে।

.... প্রথম পর্ব